নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।
–বেগম খালেদা জিয়া

দেশের বাইরে আমাদের বন্ধু আছে, কোন প্রভূ নাই।
–বেগম খালেদা জিয়া

ঐতিহাসিক পটভূমি:

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ সুদীর্ঘকাল ছিল শোষকের স্বর্গ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় বাংলার জন্যে বহন করিয়া আনে এক অন্ধকার যুগ। দুইশত বৎসরকাল যাবত বৃটিশ শাসনে বাংলার আদি কর্মকা-স্থল ঢাকা ও নিকটবর্তী সোনারগাঁ এলাকা হইতে সরাইয়া গংঙ্গাপাড়ে কলিকাতায় স্থাপন করা হয় এবং যাবতীয় শিল্প, কলকারখানা তথায় স্থাপন করিয়া পূর্ববাংলাকে ঐ সব শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারীতে পরিণত করা হয়। তার ফলে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্নায়ু কেন্দ্র কলিকাতা কেন্দ্রিক হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণের জন্যে বহন করিয়া আনে সীমাহীন দুর্দশা।

পাকিস্তানী আমল:

১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করার পর বাংলাদেশকে আবার নতুন করিয়া সবকিছু শুরু করিতে হয়। তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসন কর্তারা বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের মতই বাংলাদেশের শোষণ অব্যাহত রাখে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিকভাবে শোষিত বাংলাদেশীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অসন্তোষ বাড়িতে থাকে। সবশেষে যখন দেখা গেল পাকিস্তানী শাসনকর্তারা উর্দুকে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করিতেছে তখন ১৯৪৮ সালে

মৃদ্যুভাবে ও ১৯৫২ সালে অগ্নুৎপাতের ন্যায় ফাটিয়া পড়িল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই গণরোষের অনিবার্য ফল হিসাবে ক্ষমতাসীন দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উহার সুফল লাভে জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। সুদীর্ঘকাল যাবত সংবিধান প্রণয়নে গড়িমসি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান না করিয়া পাকিস্তানে স্বৈরশাসন অব্যাহত রাখা হয়। অবশেষে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করিয়া ঐ স্বৈরশাসনকে পাকাপোক্ত করা হলে এ দেশবাসী বুঝিল যে পাকিস্তানে তাহাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন হতে থাকে অব্যাহত গতিতে।

গণ আন্দোলন/মুক্তিযুদ্ধ

অবশেষে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় গণ আন্দোলন। ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠী ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনের বিরাট গণরায় স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে গেলে সেই রায়কে অকার্যকর করার জন্যে আলোচনার বাহানা করিয়া এই দেশের মাটিতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আনয়ন করা হয়। আমাদের নেতারা সেই সময় এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। শুধু তাহাই নহে যখন সত্যি সত্যি ২৫ মার্চ সৈন্যবাহিনীকে লেলাইয়া দেওয়া হয় নিরীহ দেশবাসীর উপর তখনও তাহাদের ঘোর কাটে নাই এবং আগেকার আন্দোলনগুলির মতই দেশের নির্বাচিত নেতা হানাদার বাহিনীর কাছে আগে ভাগেই আত্মসর্ম্পণ করিয়া বসেন। দেশবাসী হয় বিহবল ও হতাশ। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

স্বাধীনতার ঘোষণা : জিয়াউর রহমান

এই কঠিন সময়ে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের দুঃসাহসী এক বীর সন্তান জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। দিশাহারা দেশবাসী, স্বকর্ণে শুনিল বজ্রকণ্ঠের সেই ঘোষণা:

‘আামি মেজর জিয়া বলছি। আমি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আপনারা অস্ত্র ধরুন।’

তার এই ঘোষণা দিশাহারা জাতিকে দেয় দিক নির্দেশনা। ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, চাষী, মজুর, কামার,

কুমার, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে তথা সমগ্র জাতি অবতীর্ণ হয় এক অবিস্মণীয় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামে।

স্বাধীনতা-উত্তর দুঃশাসন:

অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বিজয় আমাদের করায়ত্ত হয়। কিন্তু যাহাদের হাতে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাহারা জাতীয় সরকার গঠনের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া কায়েম করিল একটি দলীয় সরকার। মুক্তিযুদ্ধের ফসল উহারা জনগণের দ্বারা প্রান্তে পৌছাইতে ব্যর্থ হয় চরমভাবে। দুর্নীতি ও কুশাসনে দেশে নামিয়া আসে এক চরম হতাশা। প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করা হয় ব্যাপক শক্তি প্রয়োগে। সিরাজ সিকদারসহ প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা এই স্বৈরশক্তির কাছে প্রাণ হারায়। এই সময়ে আসে এই দেশের সর্ববৃহৎ দুর্ভিক্ষ। দৈনিক ইত্তেফাকের ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বরের সংবাদ শিরোনাম ছিল 'দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু'। বিবিসির উদ্ধৃতি দিয়া ঐ সংবাদে বলা হয় শুধুমাত্র রংপুরেই ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লোক মারা যায়। ঢাকার রাস্তাঘাটে অভূক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত হাজার হাজার বিবস্ত্র নরকঙ্কাল। হত্যা, গুম, রাহাজানি ও ছিনতাই ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। নৈরাজ্যকর ও শাসরুদ্ধকর এই পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর যখন সোচ্চার হওয়া মাত্র শুরু হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত আসে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এই আইনের অধীনে বিনা কারণে এবং বিনা বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়। মানবাধিকার লংঘনের ইহা ছিল একটি নিকৃষ্টতম প্রচেষ্টা, এই আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ইহার পর পরই আসে ১৯৭৫ সালে জারিকৃত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী যাহা দ্বারা দেশে প্রচলিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর দিয়া একদলীয় শাসন কায়েম করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হত্যা করিয়া এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। দেশের যাবতীয় সংবাদ পত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করিয়া শুধু চারটি সরকার নিয়োজিত সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রথম দেশে সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে ইহার সদস্য করিয়া তাহাদের রাজনীতিতে জড়িত হয়। সেই সংঙ্গে সেনা বাহিনীর প্রতি অবহেলা

প্রদর্শন পূর্বক আরও একটি সমান্তরাল সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম দেওয়া হয় দলীয় স্বার্থে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে স্বৈরশাসনের ভিত্তিমূল স্থাপনের কাজ চলিতে থাকে অব্যাহত গতিতে।

সিপাহী-জনতার উত্থান:

দেশবাসীর বিশ্বাসের অমর্যাদা করিয়া এইভাবে গণতন্ত্র হত্যা, অর্থনীতি ধ্বংস, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতির ব্যাপকতার ফলে জনগণের ক্রোধ তুঙ্গে ওঠে। ফলে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর দেশের সিপাহী-জনতার এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের হোতাদের উৎখাত করা হইলে শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবসান ঘটে। এই বিপ্লবের ফলেই স্বাধীনতার মহান ঘোষক জিয়াউর রহমান বন্দী দশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পিত হয়। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এ সার্বভৌমত্বকে রক্ষা ও সুসংহত করিবার জন্যে এই মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন জিয়াউর রহমান।

বিএনপি আমল: দেশের স্বর্ণযুগ

দায়িত্বভার গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই দেশে আইনের শাসন পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী জিয়াউর রমহান প্রথমেই জনগণের তাঁর প্রতি আস্থা আছে কিনা যাচাই করিয়া, দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, দেশবাসীর সমস্যাসমূহ নিজ চোখে দেখিতেন ও তাৎক্ষণিক সমাধান করিতেন। টেকনাফ হইতে তেতুলিয়া পর্যন্ত চলিয়াছে উন্নয়নের জোয়ার। সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশবাসীর সাথে ব্যক্তিগত ও আত্মিক যোগাযোগ ঘটিল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। দেশবাসীর মনে আবার আস্থা ফিরিয়া আসিল। এইবার একজন সত্যিকার জন নায়ক আসিয়াছেন। এক দলীয় শাসনের অবসানে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জিয়া পূর্ববর্তী সরকারের আমলের দশ হাজারেরও বেশি রাজবন্দীকে মুক্তি দেন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেন। তিনি শহর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকা-কে লইয়া যান গ্রামাঞ্চলে। গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মৃত্যুপ্রায় গ্রামগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। শহরে ও গ্রামে সমান্তরাল গতিতে চলিল উন্নয়ন ও উৎপাদনের কর্মকাণ্ড। বস্তুত, জিয়াউর

রহমানের পাঁচ বৎসর শাসনকালই ছিল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ।

এই সময় জিয়া সেনাবাহিনী হইতে পদত্যাগ করিয়া দেশকে উপহার দিলেন ত্যাগী কর্মী নারী ও পুরুষদের একটি সুন্দর সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান বিএনপি। এই বিএনপি আমলেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার হয়। সারাদেশে ১৪০০ (এক হাজার চারশত) খাল কাটিয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গণশিক্ষা কার্যক্রম মারফৎ ৪০ লাখ লোককে সাক্ষর করা, ৮০ লাশ গ্রাম প্রতিরক্ষা কর্মী সৃষ্টি মারফৎ গ্রামে চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানি বন্ধ করিয়া চিরবঞ্চিত গ্রামবাসীকে স্বস্তিদান, হাজার হাজার মাইল রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৭,৫০০ (সাতাশ হাজার পাঁচশত) পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে গ্রামবাসীর চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান, নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, সবুজ বিপ্লব ঘটাইয়া দুর্ভিক্ষাবস্থার অবসান, যুব উন্নয়ন ও মহিলা মন্ত্রণালয় স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব ও মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ, ধর্মমন্ত্রণালয় সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বীকে স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, বিনামূলে কারিগরি শিক্ষাদানপূর্বক বহিঃর্বিশ্বে নতুন নতুন কর্মসৃষ্টি ও বেকারত্ব ঘোচানোর পথ প্রশস্তকরণ, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান প্রভৃতি মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রতিটি ক্ষেত্রে জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি দেশে একটি নীরব ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটান।

বৈদেশিক বিশে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একটি গতিশীল ও অর্থবহ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া জিয়াউর রহমান একজন বিশ্বনেতার সম্মান লাভ করেন। তাহার আমলে সৃষ্ট ভাবমূর্তির কারণেই প্রাচ্যের সবচাইতে শিল্পোন্নত দেশ জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। দেশবাসীর জন্যে ইহা ছিল একটি বিরল সম্মান। মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ আলকুদস কমিটির তিন সদস্যের একজন হইবার বিরল সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন জিয়া। জিয়াউর রহমানই ছিলেন আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সৃষ্ট সার্কের মূল উদ্যোক্তা ও প্রস্তাবক। সার্কের প্রথম সভায় সার্কভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের স্বীকৃতিমূলক বক্তব্য দেশবাসী গর্বের সাথে স্মরণ করে। সেই সঙ্গে জিয়াউর রহমান দেশে তৎকালে প্রচলিত দেউলিয়া রাজনীতির পরিবর্তে একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরাইয়া

দেন। জাতিকে উপহার দেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সূচনা হয় দেশের খাটি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। বাংলাদেশের খাটি প্রেমে উদ্বুদ্ধ সঙ্গীত 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় বাংলাদেশের সর্বত্র। ভিনদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী ও অর্থবহ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসে এক নতুন জোয়ার। ব্যক্তিগত চরিত্র ও সততার ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান স্থাপন করেন এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে আবার কালমেঘ

কিন্তু দেশবাসীর ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হইল না। এরশাদ গোষ্ঠী ও গণতন্ত্রের চিহ্নিত শত্রুদের চক্রান্তে জিয়াউর রহমান শহীদ হইলেন। বাংলাদেশের আকাশে নামিয়া আসে পুনরায় দুর্যোগের ঘনঘটা। জিয়া শহীদ হইবার পরেই সদ্য-নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে অস্ত্রের মুখে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ক্ষমতা দখল করে এরশাদ চক্র। সেনবাহিনী প্রধান হিসাবে শাসনতন্ত্র রক্ষার শপথ গহণকারী এরশাদ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে করেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

স্বৈরশাসনের নয় বৎসর: ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

এরপর সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল যাবৎ চলিল দেশের বুকে স্বৈরশাসনের নারকীয় তা-বলীলা। সেই সঙ্গে ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন চলিল অব্যাহত গতিতে। এই কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে যোগ দেয় দেশের নামকরা লুটেরা বাহিনী। বেআইনী ক্ষমতা দখলকে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা অর্পণের মনগড়া বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই সব গর্হিত ও বেআইনী কার্য-কলাপের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিল বিএনপির বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত যুদ্ধ। সব দখলদার বাহিনীর মতই এরশাদ বাহিনী ক্ষমতাচুত্য বিএনপি ধ্বংসের কাজে আত্ম নিয়োগ করে প্রথম হইতেই। এই কাজে তাহার সঙ্গে সাগ্রহ সহযোগিতা করে ঐ মুখচেনা স্বৈরতন্ত্রী চক্রটি। মুখে মুখে আন্দোলনে সাড়া দিলেও এই গণধিকৃত চক্রটি স্বৈর সরকারের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে অব্যাহত গতিতে।

এই ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা স্পষ্ট হইল ১৯৮৬ সালের তথাকথিত নির্বাচনের সময়। এই সময় হঠাৎ যৌথ আন্দোলনের পথ পরিহার করিয়া এই চক্রটি এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাইবার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতে কয়েকটি আসন পাইয়া বিরোধী দলের নেত্রীর আসনটি দখল করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। যদিও ভোট ডাকাতি এ মিডিয়া ক্যুর অভিযোগ আনা হইল কিন্তু উহা ছিল একটি পাতানো খেলা। কেননা নির্বাচনের ফলটি এই চক্রটি গ্রহণ করিয়া প্রথমে কিছু মান অভিমান ও দর কষাকষি করিয়া সবশেষে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন। এই কর্মটির ফলে সেই সময়েই স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের একটি সুবর্ণ সুযোগ দেশবাসীর হাত ছাড়া হয়। ইহা ছাড়া এরশাদের স্বৈরশাসনে যোগদানে একটি বৈধতার সীল লাভ করিলেন। বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে মন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেল। ফলশ্রুতিতে স্বৈর সরকার ও নতুন জীবন লাভ করিল। বিএনপি ও তদীয় নেত্রী খালেদা জিয়া কিন্তু এই সবে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহাদের দাবি এরশাদের পদত্যাগ ও এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচন নয় এই দাবিতে অনড় অটল থাকিলেন। এই দাবির পক্ষে তাহাদের আন্দোলন চলিতে থাকিল অব্যাহত গতিতে।
এইদিকে মুখচেনা এই চক্রটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে থাকিল এই বলিয়া যে আন্দোলনের মাধ্যমে নয় বরঞ্চ ব্যালটের মাধ্যমেই এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব।আন্দোলনের বিরুদ্ধে হঠাত প্রদত্ত বক্তব্যে দেশবাসী হতাশ হইল। অবশ্য এই পরিচিত মহলটি এইরুপ ভোল পাল্টাইবার ইতিহাস নতুন কিছু নয়। আন্দোলনের চরম মুহুর্তে ইহাদের আত্মসমর্থনের প্রবণতা ইতিপূর্বে সংঘটিত সব আন্দোলনকেই মধ্যপথে থামাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু বিএনপির প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে এরশাদ ভীত সন্ত্রস্ত্র হইয়া ৮৬'র জাতীয় সংসদ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনঃনির্বাচন ঘোষণা দেন। জনতার রুদ্র মূর্তিতে একবার (১৯৮৮ সাল) অবশ্য সেই মুখচেনা চক্রটি নির্বাচনে যাইতে সাহস করিল না।
নির্বাচনে না গেলেও এই চক্র যৌথ আন্দোলনে আসিতে অস্বীকার করিতেই থাকিল। বিএনপির আপোসহীন সংগ্রামে দেশের ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় ক্রমেই আকৃষ্ট হয় এবং দেশের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রার্থীরা একচ্ছত্রভাবে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এই পর্যায়ে ১৯৯০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্যে স্ব স্ব রাজনৈতিক দলসমূহের উপর চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা যৌথ আন্দোলনে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। এই সম্মতি দানেও কতিপয় শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে স্বৈরশাসনের অবসান:

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সব সময়ই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। দেশবাসী স্বৈরশাসনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করুক ইহাই ছিল তাহার একমাত্র মূল লক্ষ্য। ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষের তীব্রতায় এরশাদ প্রথমে সান্ধ্য আইন ও পরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে কিন্তু কিছুতেই গণ-আন্দোলন দমিত হইল না বরং জনতার ঢল নামিল রাস্তায় সান্ধ্য আইন ভাঙ্গিতে। শেষে এরশাদ বিরোধীদলসমূহের প্রতি কিছু সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাদানও চক্রান্তকারী ঐ মুখচেনা দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি নীল-নকশা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু এই সব কোন কাজে আসিল না। গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড চাপে ভীত সন্ত্রস্ত এরশাদ অবশেষে পদত্যাগে বাধ্য হয়। শেষ চেষ্টা হিসাবে সামরিক আইন জারীর অপচেষ্টা ও সশস্ত্র বাহিনীর দেশ-প্রেমিক নেতাদের বিচক্ষণতার ফলে ব্যর্থ হয়।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের মূল কাজ একটি সুষ্ঠু ও অবাধ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক শাসন পুনবর্হাল করা। এই লক্ষ্যেই ঘোষিত হইয়াছে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর নির্বাচন।

সংক্ষেপে ইহাই হইল আগামী নির্বাচনের পটভূমি। আশা করা যায়, এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে হইবে। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই সুবর্ণ সুযোগকে আমাদের কাজে লাগাইতেই হইবে। ইহার কোন বিকল্প নাই। এইবার আমাদের ব্যর্থতা জাতির জন্যে ডাকিয়া আনিবে সর্বনাশ। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক দলসমূহ তাহাদের কর্মসূচি রীতি আছে। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। দেশের আপামর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলই ইহার প্রথম এবং মুখ্য লক্ষ্য। জাতির প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকিয়া দেশবাসীর হাতে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সুফল পৌছাইয়া দেওয়াই ইহার কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

শহীদ জিয়া ১৯ দফার আলোকে এবারের নির্বাচনী কর্মসূচি:

দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত জিয়ার ১৯ দফা ওয়ারী নির্বাচনী কর্মসূচির মধ্যে আছে:

(ক) সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক:

১। দুর্নীতি মুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা। প্রশাসন যন্ত্রকে গতিশীল ও দুর্ণীতি মুক্তকরণ। সরকারী জনসেবায় নিয়োজিতকরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ। শৃংখলা ভঙ্গকারী দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারীদেও বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। সর্বপ্রকার কালা কানুন বাতিল করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৩। বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণ। সব দল ও মতের স্ব স্ব মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

৪। সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখ-তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শহীদ জিয়ার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।

৫। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ ও সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা। প্রতিবেশি দেশসমূহ, বিশেষত মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন। আধিপত্যবাদ, সা¤্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় নীতি অবলম্বন করা।

৬। প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠনপূর্বক উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্যক্রমের গ্রাম পর্যায়ে দায়িত্ব প্রদান করা।

৭। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রচার মাধ্যম সমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পারিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। অনগ্রসর উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৯। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদপরিবারের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি। এ জায়গায় আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কথা কিছু বলা যায় কি না?

১০। শিক্ষাব্যব্যস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন পূর্বক ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি। নিরক্ষরতা, দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমাজের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশনজট রোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরীক্ষাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবার নিশ্চয়তা বিধান।

১২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

১৩। দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
১৪। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৫। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ।

(খ) অর্থনৈতিক:

১। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান-জনগণের এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ লওয়া।

২। মুক্ত ও সহযোগিতামূলক অর্থনীতি চালু এবং দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন।

৩। শিল্পায়ন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসাবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ।

৪। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম-সংস্থানমুখী প্রকল্প গড়িয়া তোলা।

৫। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতি বিভাগে একটি আধুনিক শিশু হাসপাতাল স্থাপন।

৬। মানব সম্পদের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের আনুপাতিক বৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি।

৭। বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করিতে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কৃষককে সহজ শর্তে ঋণদানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং কৃষি ও গেচ কাজের সাহায্যার্থে বৈদ্যুতিক সংযোগের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। গরীব চাষীদের ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা। খালকাটা প্রকল্পসমূহ পুনঃচালুকরণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। সড়ক– রেল– নৌ যোগাযোগ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মত অবকাঠামোগত উন্নয়নে

ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৯। বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও ইহার পক্ষে যাবতীয় বাধা ও জটিলতা দূরীকরণ।

১০। সূষম সম্পদের সর্বাধিক ও সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার দ্বারা আগামী ৪র্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক দ্রুত সম্পন্ন যোগ্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ। অত্র বরাদ্দের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান। জনসংখ্যা রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহকে যেমন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রেলওয়ে ও শিল্প ইউনিটসমূহে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিয়া দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও জবাবদিহিকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।

১২। মুদ্রাস্ফীতি রোধে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখিবার দৃঢ় অথচ বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করত জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল নিশ্চিতকরণ। ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণে যন্ত্রচালিত পণ্য রফতানির বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমঘন রফতানি স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান। অপ্রয়োজীয় অথবা স্বল্প প্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী আমদানি সীমিতকরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ।

১৪। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের পথ প্রশস্তকরণ।

১৫। শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের স্বল্পব্যয় অথবা বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পূঁজি যোগান দিয়া আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করিয়া বেকার সমস্যর সমাধানে বাস্তব পদেক্ষপ গ্রহণ।

১৬। সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজের সম্মানজনক ভুমিকা নিশ্চিতরণ।

১৭। সকল ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের উৎসাহ প্রদান। অনুৎপাদনশীল ব্যয় ও অপচয় রোধ। সরকারী ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে বাজেটের নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৮। জাতীয় স্বার্থ ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ দান।

১৯। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভুমিকার সঠিক মূল্যায়ন ও ইহাদেরকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রতিবন্ধকতার দূরীকরণ।

২০। উপরে বর্ণিত কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে এবং দ্রুত সত্তর স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে বিএনপি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, অনুৎপাদন খাতে ব্যয় হ্রাস এবং বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া এবং বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি আয়তন সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্জিত কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করিয়া সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্পদ বিতরণের পদক্ষেপ নেওয়া।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক:

১। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে আমাদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো। দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাকে অব্যাহত গতিতে চালনা করিয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে

এদেশমুখী করা এবং বাংলাদেশী শিল্প ও সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশে বাংলা একাডেমীর ভুমিকাকে আরো অর্থবহ করা।

২। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীদের তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান।

ইহা ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্র গঠনতন্ত্র ও পার্টি আদর্শ পুস্তিকায় উল্লেখিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণও এই কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মানবাধিকার:

বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে এবং এই লক্ষ্যে বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহে বাংলাদেশকে পক্ষ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে। বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায় ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

সারসংক্ষেপ:

সংগ্রামী জনতার ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে আবার সুযোগ আসিয়াছে স্বাধীনতার সুফল জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌছাইবার। দেশবাসী ১৯৪৭ সালে একবার ও ১৯৭০ সালে আর একবার শোষনের অবসানের আশায় তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছিল। উভয় বারই প্রতারিত হয় দেশবাসী। এ ভোট লাভ করিয়া যাহারা ক্ষমতাসীন হন তাহারাই রাতারাতি ভোল পাল্টাইয়া গণতন্ত্রের কবর দিয়া, স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সাথে শোষনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করেন। গরীবরা আরো গরীব হয় বিত্তশালীরা হন আরও বিত্তশালী। রক্ষক হয় ভক্ষক।

এই অবস্থা অবসান কল্পে দেশবাসী ও সাধারণ সিপাহীরা একযোগে ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বরে স্বৈরশাসনের উৎখাত করে। আসে স্বাধীনতার ঘোষক মহান বীর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির শাসনকাল।

জিয়াউর রহমান দেশে একটি সৎ ও সুষ্ঠু বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দেন যার সুফল লাভ করে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সকল দলই। বাংলাদেশীদের নিজ ভাষা সংস্কৃতির বাহক ও ধারক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদেও সঙ্গে সঙ্গে দেশকে উপহার দেন বিএনপির ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান যার নেত্রীত্বে আছেন তাহার যোগ্য উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়া। দলীয় প্রতীক হিসাবে উপহার দেন ধনী গরীব তথা সমগ্র দেশবাসীর অতিব প্রয়োজনীয় ধানের শীষ। কিন্তু হায়েনার দানব ওঁৎ পাতিয়াই ছিল। উহাদের থাবা বাঙ্গালীর এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হইতে দিল না। ইহারা প্রথমে বাংলার শাফুল জিয়াউর রহমানকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে ও পরে পরেই বিপুল গণরায়ের ভিত্তিতে গঠিত বিএনপি সরকারের অস্ত্রের মুখে করে ক্ষমতাচ্যুত।

শহীদ জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিএনপি প্রথম হইতেই এই স্বৈরশাসকদের দেয়া চ্যালেঞ্জ আন্দোলনের মধ্য পথে অনেকেই এরশাদের নির্বাচনের ফাঁদে ধরা দিলেও বেগম জিয়ার আপোসহীন নেত্রীত্বে নয় বৎসরের সংগ্রাম শেষে স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পথে যাবতীয় বন্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়।

উপসংহার:

দেশবাসীর সামনে এই উন্মোচিত সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। এই নয় বৎসরের সংগ্রামে যাহার নেত্রীত্বসকলের উপরে স্থান লাভ করিয়াছে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব খালেদা জিয়ার বিএনপিকে ধানের শীর্ষে ভোট দিন। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে একমাত্র খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে বিএনপি সরকারই উপরোক্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করত বাংলাদেশকে দ্রুতগতিতে একটি শোষণমুক্ত,

সুখী, সমৃদ্ধশালী, উৎপাদনমুখী ও প্রগতিশীল জাতিতে পরিগণিত করিতে পারে।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ